প্রসঙ্গ: হৃদয়চর্চা

জয়া চক্রবর্তী

শতবর্ষের প্রান্ত লগ্নে দাঁড়িয়ে কোনো লেখকের লেখার মূল প্রণোদনা কী তা তাঁর সারাজীবনের সৃষ্টির মধ্যেই ছড়িয়ে থাকে; মূল প্রবণতাটুকু অন্তরিত হয়ে থাকে তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে। শতবর্ষের প্রান্তসীমায় দাঁড়ানো সেই লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (জন্ম ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি) সৃষ্টির মূলে আছে 'হৃদয়চর্চা'। এই হৃদয়চর্চা আসলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক— এই সম্পর্ক নিকট সম্পর্ক, দূরের সম্পর্ক, ব্যষ্টি-সমষ্টির সম্পর্ক। নিজের সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে নরেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পিছন ফিরে তাকিয়ে বই না পড়ে নিজের গল্পগুলির কথা যতদূর মনে পড়ে আমি দেখতে পাই, ঘৃণা বিদ্বেষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, বৈরিতা আমাকে লেখায় প্রবৃত্ত করেনি। বরং বিপরীত দিকের প্রীতি, প্রেম, সৌহার্দ্য, স্নেহ শ্রদ্ধা ভালোবাসা, পারিবারিক গণ্ডির ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বারবার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাতে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে? তা জেনেও আমি আমার সীমার বাইরে যেতে পারিনি।'[১]

'সম্পর্ক' এমন একটি মানসিক ব্যাপার যা মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক যোগ তৈরি করে। এই সম্পর্ক তৈরি হয় প্রেম-ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায়, কখনো বা অকৃতার্থতা, কৃতঘ্নতায়। সম্পর্কেরও স্তরভেদ আছে— নিকট সম্পর্ক, দূরের সম্পর্ক, ব্যষ্টি-সমষ্টির সম্পর্ক। লেখকের এক প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনো এক ঘটনার প্রতিঘাতে লেখকের উপলব্ধি হয়েছে, 'আমাদের বুদ্ধির চাষ যত বাড়ছে, হৃদয়ের ফলন তত কমছে। পারিবারিক গণ্ডির ভিতরেই হোক, আর বাইরেই হোক, আমাদের হৃদয়ের উত্তাপ কমে আসছে। বুদ্ধির দোহাই দিয়ে যুক্তির দোহাই দিয়ে আমরা হৃদয়কে শুকিয়ে ফেলেছি।'[২] আমরা যত নাগরিক হচ্ছি, একান্নবর্তী পরিবারগুলো যত টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙছে তত সেকালের আত্মীয়-কুটুম্ব পাড়াপড়শি পরিবৃত সেকালের মানুষ ধীরে ধীরে একালে আমাদের হৃদয়ের শুষ্কতার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেন; হৃদয়ের গভীর থেকে তাঁরা উপলব্ধি করেন সেকালের তুলনায় আমাদের হৃদয় অপরিসর অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি হৃদয়কেই তুল্যমূল্য হিসাবে ধরলে 'বাঙালি মধ্যবিত্তের মনের দর্পণে যে

বিশ্বরূপের ছায়া পড়ে, তা ভুয়োদর্শন না হলেও একেবারেই যে ভুয়োদর্শন একথা জোর দিয়ে বলা যায় না, কারণ আধুনিক শিল্প-সাহিত্য এই মধ্যবিত্ত নাগরিকেরই সৃষ্টি। পোশাক-পরিচ্ছদে আচারে-ব্যবহারে রুচিতে-রীতিতে সারা দেশ সজ্ঞানেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক এই মধ্যবিত্তের অনুসরণ করছে।[৩] ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথমে ক্রমাগত একান্নবর্তী পরিবার ভাঙতে থাকে এবং নগরমুখী মানসিকতা প্রবলাকার ধারণ করায় কর্মসংস্থানের আশায় ব্যাপকভাবে শহরে চলে আসার প্রবণতাও দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি ব্রিটিশ অধীনস্থ সওদাগরি অফিস বা অন্যত্র নানাধরনের চাকরিতে যোগ দেয়। একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙে শহরে চলে আসায় অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর ছোটো ছোটো মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো যেন 'কবুতরের খোপে' পরিণত হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী এবং দু-একটি সন্তান নিয়েই আধুনিক শহরে এ একটি পরিবার, যেখানে মামি-পিসি তো দূরের কথা, বুড়ো বাপ মায়েরও তাতে স্থান সংকুলান হয় না।

ঊনবিংশ শতকে গ্রামীণ মধ্যবিত্তের জীবনচর্যা থেকে শহুরে মধ্যবিত্তের জীবনচর্যা সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে পড়ে— 'আমাদের সংস্কৃতিতে যে পূর্বকথিত গ্রামীণ সুর ছিল তাকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠল আধুনিক যুগের নাগরিক সুর, আমাদের বদ্ধ জনজীবনের প্রাঙ্গণে বিশ্বের স্রোত আরও বেশি অর্থবহরূপে এসে পৌঁছল।'[৪]

এইভাবে বাঙালি সমাজে যে 'মধ্যবিত্ত কালচার' বা 'মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি' প্রকাশ পায় সেখানে পারিবারিক সম্পর্কের বিন্যাসও পাল্টে যায়। পূর্বে শাশুড়ি মারা না গেলে বা অশক্ত না হলে বউ সংসারের কর্ত্রী হতে পারত না। কিন্তু বিংশ শতকে যে শহরে মধ্যবিত্ত কালচার তাতে স্ত্রী-স্বামীর কর্মস্থলে নতুন সংসার পাতে, যেখানে সেই সর্বেসর্বা— একান্নবর্তী পরিবারের শাশুড়ির প্রভাব থেকে সে শতদূর হস্তে বিরাজমানা— সেখানে সে স্বাধীন। অধিকারবোধ সম্পর্কেও সচেতন। আগেকার দিনে মা ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ ঘটলে ছেলের পক্ষে স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করা ছিল অত্যন্ত অশোভন; ন্যায় অন্যায়— যাই-ই করুক না কেন ছেলে মায়ের পক্ষ অবলম্বন করলে সেটিই হত শোভন ও ছেলের পক্ষে তা পৌরুষের পরিচয় বহন করত। এখন এর পরিবর্তন ঘটেছে; এখন জননী আর জায়ার বিবাদ ঘটলে ছেলে দু'জনের তুল্যমূল্যের বিচার করতে চায়— 'মাকেও দু'কথা বলে, স্ত্রীকেও দু'কথা বলে। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাকে দু'কথার কিছু বেশিই শুনতে হয়। কিন্তু স্ত্রীর ওপর এই পক্ষপাতিত্বের সেকালেও কিছু অভাব ছিল।'[৫] কালের ধারণার

বিচারে এখনকার ছেলেরা স্ত্রীর ব্যক্তিত্বকে যেমন বেশি মূল্য দিচ্ছে তেমনি তার অধিকারবোধকেও স্বীকার করে নিচ্ছে, কারণ আধুনিক তরুণ যুবকের ধারণা স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ও অধিকারবোধকে মূল্য দিয়েও বাবা-মায়ের উপর কর্তব্য করা যায়।

একদল সমালোচক বলেন, গ্রামীণ একান্নবর্তী জীবন থেকে বেরিয়ে যে শহরে ছোটো ছোটো পরিবার তৈরি হয়েছে সেগুলো যেন স্বার্থপরতার ছোটো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে। তাঁরা এও অভিযোগ করেন আগেকার স্বামী-স্ত্রীর তুলনায় এখনকার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার উত্তাপ কম। এখনকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আধুনিক স্ত্রী আর আগের মতো পতিগতপ্রাণা নেই। স্বামীর জন্য আগেকার স্ত্রী যেমন আত্মত্যাগ করত, নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বিলিয়ে দিয়ে সমস্ত সত্তাকে লোপ করে দিত, এখন আর সেদিন নেই— এখন দাম্পত্য সম্পর্কে হৃদয়ের স্থান যেন বড়ো কম— 'এরা যেন কারবারের দুই সমান অংশীদার। লাভ লোকসান, সুযোগ-সুবিধা চুলচেরাভাবে এরা ভাগ করে নিতে চায়। কেউ কারও দোষত্রুটি ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করবে না, অন্যায় অত্যাচার সহ্য করবে না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে স্ত্রীকে আর রাগ করে বাপের বাড়ি যেতে হবে না, সোজা উকিলের বাড়ি গেলেই চলবে। বিবাহ-বিচ্ছেদের দোর খুলে দেওয়া হয়েছে।'[৬] প্রাচীনপন্থীদের মতে এতে মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং সুষ্ঠু দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে— দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমা মার্জনা বা সহনশীলতা থাকবে না— দুই অংশের মিলনের ফলে যে পূর্ণতা, একাত্মতা তাকে তিলে তিলে গড়তে হয়। তার জন্য স্বামী-স্ত্রীর তুল্য অধিকার, মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতির প্রয়োজন— হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা হবে এই স্বীকৃতির ওপরে।'[৭] বস্তুত এখনকার দাম্পত্য প্রেম অধিকার সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত— দুই অধিকারীর মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ বাধলেও স্ত্রীকে কোনো বিষয়েই অনধিকারিণী করে রাখা চলবে না। আগেকার দিনের মেয়েরা ছিলেন শুধুই ঘরনি— স্বামীর স্ত্রী আর সন্তানের মা ছাড়া তাঁর আলাদা কোনো সত্তা ছিলনা। জায়া আর জননী হিসাবে সার্থক হলেই তাঁদের জীবন সার্থক— স্বামীর পদোন্নতিতেই স্ত্রীর উন্নতি, সন্তানের যশেই মায়ের যশ। মায়েরা আলাদা করে নিজেদের সত্তার কথা ভাবতেই পারতেন না; কিন্তু এখন পারেন, কারণ শিক্ষিতা নারীর স্বামী-পুত্র ছাড়াও আত্মবিকাশের তৃতীয় মাধ্যম আছে— সেই মাধ্যম তিনি নিজে। পুরুষের মতো তাঁরও জীবিকা আছে এবং বিশাল কর্মক্ষেত্রে তাঁর উন্নতির সাধ এবং সাধনা দুই-ই আছে। সাহিত্যে, বিজ্ঞান, রাজনীতিতেও তিনি স্থান করে নিয়েছেন— 'এখনকার বধূ একান্নবর্তী পরিবারের বধূ নন,এক সভ্যতাবর্তী বৃহৎ বিশ্বের নাগরিক। এখনকার স্ত্রী পতিগতপ্রাণা হলেও তাঁর মন

বুদ্ধির গতিবিধি নানাদিকে ধাবিত।'[৮] এর ফলে আজকের নাগরিক দাম্পত্য জীবনের চেহারাও বদলে যাচ্ছে— সেবা আর পরিচর্যায় স্ত্রী হৃদয়চর্চার সুযোগ আগের থেকে অনেক কম— যে স্ত্রীকে ঘরে-বাইরে দু'দিকে সামলাতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে স্বামী সন্তানের স্বাচ্ছন্দ্যে একটু ভাটা পড়া স্বাভাবিক— বস্তুত আধুনিক যুগে 'স্ত্রীর কাছে স্বামীর প্রত্যাশার পরিবর্তন হচ্ছে। এখনকার স্বামী স্ত্রীকে শুধু ভালো রাঁধুনি আর সেবিকা হিসাবে দেখতে চায় না; অর্থে আর খ্যাতিতে তার সামাজিক প্রতিষ্ঠাও চায়। আগে ছিল স্বামীর যশে স্ত্রী যশস্বিনী, আজকাল স্ত্রীর যশ না বাড়লে দাম্পত্য জীবনের পুরো রস থাকে না।'[৯] এইভাবে প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের রূপও বদলে গেছে।

পূর্বে দোর্দণ্ডপ্রতাপ পিতার আজ্ঞাই সর্বক্ষেত্রে শিরোধার্য ছিল— পিতার অযৌক্তিক আচরণ এখনকার পুত্রেরা মেনে নিতে চায় না— 'এখনকার পিতা শুধু ভক্তির পাত্র নয়, ভয়ের পাত্র নয়, শিক্ষিত যুবক-পুত্রের সমালোচনারও পাত্র।'[১০] পূর্বে অলস অক্ষম অযোগ্য ছোটোভাই ও তার স্ত্রী-পুত্রকে জ্যেষ্ঠভ্রাতারা প্রতিপালন করত, এখন সেদিন নেই। পূর্বে পোষ্য, এমনকী পোষ্যদেরও পালন করে পরিবারের কর্তা গ্রামের সমাজে সুখ্যাতি পেতেন এখন সেসব দিনও আর নেই।

পারিবারিক এই নিকট সম্পর্কের বাইরে দূরের সম্পর্ক আত্মীয়-কুটুম্ব এবং বন্ধুদের সঙ্গেও আগেকার তুলনায় হৃদয়ের সংযোগের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তখনকার দিনে যে কোনো শুভ উৎসব অন্নপ্রাশন, বিয়ে আর শ্রাদ্ধের মতো বৃহৎ পরিবারিক অনুষ্ঠানই সামাজিক অনুষ্ঠানের রূপ নিত— উৎসবের বহুদিন আগে থেকেই আত্মীয়-কুটুম্বের সমাবেশ লেগে থাকত— সেই তুলনায় এখনকার সামাজিক উৎসবগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি স্বীকারেই পর্যবসিত। এখন একান্নবর্তী পরিবারের সংখ্যা কমে যাওয়ায় কুটুম্ব সম্পর্ক প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। হাসি পরিহাস ঠাট্টা তামাশায় কুটুম্বিনীদের মধ্যে যে হৃদয়সম্পর্ক ছিল এখন তা ক্বচিৎ চোখে পড়ে। ভাষা থেকেই এই শব্দটি (কুটুম্ব) প্রায় উঠে যেতে বসেছে। দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি তো দূরের কথা নিকট সম্পর্কের জ্যাঠা, খুড়ো, জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাই-বোনদের সঙ্গেও আজ সম্পর্কের সূত্র ক্ষীণ হয়ে এসেছে— এক পরিবার তো দূরের কথা, এক পাড়া এক শহরেও সবাই থাকে না— কর্মব্যস্ত জীবনে খুব কমই দেখাসাক্ষাৎ হয়। জ্ঞাতির সঙ্গে রক্তের সম্পর্কের জোর কমেছে— জ্ঞাতি কুটুম্বের পরিবর্তে আমরা পেয়েছি জীবনের নানাস্তরের বন্ধুদের; কিন্তু সেই বিভিন্নস্তরের বন্ধুদের মধ্যেও হৃদয় সম্পর্কের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। চায়ের টেবিলে কিংবা সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করার মতো সুহৃদের সংখ্যা

বাড়লেও বৈঠকখানার চৌকাঠ পার করে হৃদয়ের অন্দরমহলে স্থান করে নেওয়ার মতো সুহৃদ খুব কমই মেলে। সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সৌহার্দ্যের ধারণাও পরিবর্তন ঘটেছে।

আজ পীড়িত প্রতিবেশীকে আমরা নিজের হাতে শুশ্রূষা করতে যাই না— তাঁকে হাসপাতালে যাওয়ারই পরামর্শ দিই। বিজ্ঞান যত এগোচ্ছে, ব্যবহারিক জীবনে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি ও ফলিত বিজ্ঞানের প্রয়োগও যত বাড়ছে তত প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়চর্চার সুযোগ কমে আসছে। এই পরোক্ষ হৃদয়চর্চার প্রভাব আমাদের সাহিত্য চর্চাতেও পরিস্ফুট— 'এখনকার কাব্য আর কথাসাহিত্য আবেগের বেগ সংবরণ করেছে। কথায় কথায় নায়িকারা চোখের জল ফেলে না, নায়করা প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয় না, আত্মহত্যা করে না। সমাজের মতো সাহিত্যেও হৃদয়চর্চার রূপ বদলেছে।'[১১] এখন হৃদয়চর্চার ক্ষেত্র শুধু পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ, তার বাইরে এই ক্ষেত্র খুবই সংকীর্ণ হয়ে এসেছে— 'হৃদয় আর হৃদয়চর্চার রূপ বদল হচ্ছে। হৃদয়বৃত্তি এখন বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে পরিশীলিত, পরিমার্জিত। হৃদয়াসনেও আমরা আবেগের বদলে যুক্তিকে এনে ডেকে বসাচ্ছি। আমাদের অন্তর সায় দিক আর না দিক এই রূপান্তর আমি চাই।'[১২]

কিন্তু সব জেনে সব বুঝেও মন কাঁদে, হৃদয় কাঁদে— সেই পুরোনো দিনের জন্য, পুরোনো হৃদয়ের জন্য কান্না পায়— আজও প্রাচীনপন্থীদের হৃদয়ে ফেলে আসা একান্নবর্তী পরিবারের জন্য দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। আজও মনে হয় 'হৃদয় মানে নির্ভেজাল আবেগ, অযৌক্তিক মত্ততা, এমনকি উন্মত্ততা।'[১৩] সেই পুরোনো হৃদয়ের জন্যে মন হাহাকার করে— দিতে গিয়ে না দিতে পারার গ্লানি নিতে গিয়ে রিক্ত হাতে ফিরে আসার হাহাকার বিদ্ধ করে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের এই রূপান্তর অনিবার্য আর তা মেনে নিতেও কয়েক পুরুষ চলে যাবে— উত্তরপুরুষদের কাছে সেই হৃদয়হীনতার জন্য আক্ষেপ, হৃদয়ের জন্য দুঃখ, লজ্জা ও অচরিতার্থতার কী কোনো মানে থাকবে? সময়ই তা বলবে।

উল্লেখসূত্র

১। নরেন্দ্রনাথ মিত্র: গল্প লেখার গল্প, নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ৬১৮–১৯।

২। নরেন্দ্রনাথ মিত্র: হৃদয়চর্চা (নিবন্ধ সংকলন); সংকলন-সম্পাদনা অভিজিৎ মিত্র; কারিগর; প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৫, পৃ. ১২।

৩। তদেব; পৃ. ১৩।

৪। জীবন্দ্রে সিংহ রায়: 'কল্লোলের কাল', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৮৮।
৫। নরেন্দ্রনাথ মিত্র: হৃদয়চর্চা (নিবন্ধ সংকলন); সংকলন-সম্পাদনা অভিজিৎ মিত্র; কারিগর; প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০১৫, পৃ. ১৬।
৬। তদেব, পৃ. ১৬।
৭। তদেব, পৃ. ১৭।
৮। তদেব, পৃ. ১৭।
৯। তদেব, পৃ. ১৭।
১০। তদেব, পৃ. ১৮।
১১। তদেব, পৃ. ২০।
১২। তদেব, পৃ. ২০।
১৩। তদেব, পৃ. ২০।